মানুষের জিজ্ঞাসা

আল্লাহর জবাব

মাওলানা মোফাজ্জল হক

ইসলামী জ্ঞান গবেষণা সিরিজ-২৬

মানুষের জিজ্ঞাসা আল্লাহর জবাব

মাওলানা মোফাজ্জল হক

প্রকাশক

খন্দকার প্রকাশনী

পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯

মানুষের জিজ্ঞাসা আল্লাহর জবাব
মাওলানা মোফাজ্জল হক

প্রকাশক
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯

খন্দকার প্রকাশনীর
প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০১২ ইং

মূল্য ঃ ২২.০০ (বাইশ) টাকা মাত্র।

মুদ্রণে
আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিরিশদাস লেন, ঢাকা-১১০০।

সূচী পত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আলহামদুলিল্লাহ! পরম করুনাময়ের অপার অনুগ্রহে "মানুষের জিজ্ঞাসা আল্লাহর জবাব" নামে পুস্তিকা আত্মপ্রকাশ করলো। কুরআনের বিভিন্ন সুরায় সাহাবায়ে কেরাম ও তৎকালিন সময়ে সমাজের লোকেরা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে কিছু বিষয়ে জানার জন্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এই জিজ্ঞাসাগুলোর জবাব আল্লাহ পাক নিজের পক্ষ থেকে রাসুল (সা.) কে জানিয়ে দিয়েছেন। তার মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষের কাছে বিষয়টী সুস্পষ্টভাবে পরিস্কার হয়েছে। এতে প্রশ্নের জবাবের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ পাক জবাব না দিয়ে যদি রাসুল (সা.) নিজের পক্ষ থেকে জবাব দিতেন তাহলে শংসয়বাদীদের সন্দেহ থেকে যেত যে এটা হয়তো রাসুলের (সা.) মনগড়া কোন জবাব (নাউজুবিল্লাহ)। আল্লাহ পাক সরাসরি জবাব দেয়ায় এ ধরনের সন্দেহ প্রকাশ করার কোন সুযোগ নেই। তার পরও কেহ সন্দেহ প্রকাশ করলে তারা হবে অবিশ্বাসীদের দল।

কুরআনুল কারিমে এ ধরনের প্রশ্নের পরিমাণ খুব বেশী নয়। কারণ সাহাবায়ে কেরাম বেশী বেশী প্রশ্ন করা পছন্দ করতেন না। একান্ত প্রয়োজনীয় ও জটিল বিষয় নিয়ে হয়তো কিছু প্রশ্ন হত।

রাসুল (সা.) কে জিজ্ঞেস করা এমন কিছু প্রশ্নের জবাব যা আল্লাহ পাক নিজের পক্ষ থেকে দিয়েছেন। তার পরিমান চৌদ্দ থেকে সতেরটি হবে। তার মধ্যে আবার সাহাবীগনের নয় থেকে তেরটি বাকীটা মুশরিকদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। এভাবে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে তার মধ্যে সুরা নিসার দু'টো প্রশ্নের জবাব আল্লাহ পাক এভাবে দিয়েছেন। ইয়াফতানুনা অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন। বাকীগুলোতে "ইয়াস আলুনাকা কুল" অর্থাৎ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল "বলে জবাব দিয়েছেন"।

বিষয়গুলো সুরা বাকারায় বেশী আলোচিত হয়েছে। বাকী আরো ৮টি সুরায় ২/১টি করে প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে। এর পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

বাকারা-৮, নিসা-২, মায়েদা-১, আরাফ-১, আনফাল-১, বনি ইসরাইল-১, কাহাফ-১, ত্বাহা-১, নাযিয়াত-১ মোট সতেরটি জিজ্ঞাসার জবাব এসেছে। এছাড়া "সায়াত ও ইয়ুন ফিকুন" বিষয়ে একাধিক জিজ্ঞাসা রয়েছে। সবমিলে মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে জবাব এসেছে তা রাসুলের তেইশ বছরের নবুয়তী জিন্দেগীর কর্মসূচীকে বাস্তবায়নের কাজে বলিষ্ঠ সহযোগীতার ভূমিকা পালন করেছে। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও প্রশ্নোত্তরের যতেষ্ঠ গুরুত্ব রয়েছে। তাই সংক্ষিপ্তভাবে এখানে তা উল্লেখ করলাম। ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীল কর্মী ও সহযোগীদের জন্য বইখানা সহায়ক হবে বলে আশা রাখি। ব্যাপক জানার জন্য তাফসীর গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করুন। আমি দু'টো প্রশ্নের ব্যাপক জবাব সম্বলিত "কুরআনের ভাষায় আল্লাহর দেয়া ২টি ফতোয়া" নামে আরেকটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেছি। যা এ বিষয়ে আরো সহায়ক হবে।

ব্যাপক জানার জন্য অধ্যয়ন ছাড়া বিকল্প কিছু নেই। আল্লাহ পাক আমাদের একাজে সহায় হউন। ভুল ত্রুটি সংশোধনে আপনাদের সহায়তা কামনা করছি। আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন। আমার বাবা, মা, স্ত্রী পরিজন সহ সকল মুমিন মুমিনাতকে মাফ করুন। আমিন।

মোফাজ্জল হক
০১৭১৬-৫০৬৬৩৮

আল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ، اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ،

فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ–

যখন আমার লোকেরা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন তুমি বলে দাও আমি তাদের অতি নিকটে আছি। আমাকে যে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং উত্তর দিয়ে থাকি। কাজেই আমার ডাকে সাড়া দেয়া ও আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের কর্তব্য। এ কথাগুলো তাদের শুনে দাও যাতে করে তারা সত্যের সন্ধান পায়। (বাকারা-১৮৬)

এ আয়াত নাজিল সম্পর্কে ইবনে আবু হাতিম বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসুল (সা.) কে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ কি আমাদের কাছে আছেন না দুরে আছেন? যদি কাছে থাকেন তাহলে আমরা তার সাথে গোপনে কথা বলবো। আর যদি দুরে থাকেন তাহলে জোরে জোরে ডাকবো। একথা শুনে রাসুল (সা.) চুপ হয়ে গেলেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

তাফসীরে ইবনে কাসিরে বলা হয় হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন- আল্লাহ বলেন আমার বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে বা আমার স্মরণে তার ওষ্ঠদ্বয় নড়াচড়া করে তখন আমি তার সাথে থাকি।

আল্লাহ পাক আরো বলেন, যারা সৎখোদাভীরু তাদের সাথে আমি রয়েছি। হযরত মুসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.) কে আল্লাহ পাক বলেন আমি তোমাদের দু'জনের সাথে থেকে কথা শুনি এবং দেখি।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফহীমে বলা হয়েছে, যদিও তোমরা আমাকে দেখতে পাওনা এবং অনুভব করতে পারো না 'তবুও আমাকে তোমরা দুরে মনে করোনা। আমি আমার প্রত্যেক বান্দার অতি নিকটে থাকি। যখন চায় তখনই তারা আমার কাছে আর্জি পেশ করতে পারে। এমনকি তারা আমার কাছে মনে মনে যা কিছু আবেদন করে তাও আমি শুনতে পাই। শুধু শুনতেই পাইনা সে বিষয়ে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

সালমান ফারসী (সা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, আল্লাহর নিকট কোন ব্যক্তি যখন দু'হাত তুলে কিছু চায় তখন আল্লাহ তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। (আহমদ)

ইমাম আবু জাফর তাবারী তার তাফসীরে তাবারীতে বর্ণনা করেন, আয়েশা (রা.) বলেন, কোন লোক যখন কিছু প্রার্থনা করে এবং সে যদি তাড়াহুড়া না করে বা ধৈর্যহীন না হয় তাহলে দুনিয়ায় তাকে তা দেয়া হয় অথবা পরকালের জন্য তা সংরক্ষিত থাকে। উরওয়া জিজ্ঞাসা করলেন, আম্মাজান, তাড়াহুড়া ও ধৈর্যহীন হওয়ার অর্থ কি? তিনি জবাব দিলেন, কারো এভাবে বলা যে, দোয়া করলাম কিছু পেলাম না। ডাকলাম কিন্তু সাড়া পেলাম না। (ইবনে কাসির)

আনাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান একটি তোমার কাজ, আর একটি আমার কাজ। আর একটি কাজ তোমার আমার উভয়ের। তোমার কাজ হলো, একমাত্র আমার ইবাদত করা এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করা। আমার কাজ তোমার ইবাদত কবুল করা ও তোমার কাজ বৃথা যেতে না দেয়া। আর তোমার আমার যৌথ কাজ হলো, তোমার দোয়া করা আর আমার কবুল করা। (ইবনে কাসির)

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তিন ব্যক্তির দোয়া কখনো ফেরত দেয়া হয়না। ১. ন্যায় পরায়ন শাসকের দোয়া। ২. রোযাদারের ইফতারের সময়ের দোয়া ৩. মজলুমের দোয়া। কিয়ামতের দিনে আল্লাহ মজলুমের দোয়া সবার উর্দ্ধে রাখবেন এবং তার আগমনের জন্য আকাশের দুয়ার খুলে দিবেন। তারপর বলবেন, আমার মর্যাদার কসম। দেরীতে হলেও আজ আমি তোমাকে সাহায্য করব। (তিরমিজী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, আহমদ)

রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ، قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّى وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً-

লোকেরা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, রূহ আমার পালন কর্তার আদেশ। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে। (বনি ইসরাইল-৮৫)

এই আয়াত নাজিল সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, একবার আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাথে এক ক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময়

একদল ইহুদীও সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। তারা রাসুল (সা.) কে দেখে বলাবলি করছিল লোকটিকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলছিল জিজ্ঞেস করে লাভ কি? তিনি যদি এমন জবাব দেন যা তোমরা পছন্দ করবে না। শেষ পর্যন্ত তাকে জিজ্ঞেস করা হলো। কিন্তু তিনি কোন জবাব দিলেন না। ইবনে মাসউদ বলেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম তার উপর ওহী নাজিল হবে। আমি সেখানে উপস্থিত থাকতেই ওহী নাজিল হল এবং তিনি বললেন এইমাত্র এই আয়াত নাজিল হল। (ইবনে কাসির)

এছাড়া সুরা আস-সেজদার ৭-৯, সুরা হিজরে ২৮, সুরা সা'দে ৭১-৭৬, সুরা মুজাদালার-২২ নং আয়াত সহ কুরআনুল কারিমে রূহ শব্দ ১১ বার এসেছে। রূহী ২ বার, রুহানা ৩ বার, রুহুল কুদ্দুস ৪ বার এবং রুহুল আমীন ১ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

সুরা আস-সেজদায় বলা হয়েছে, তিনি কাদা মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টির সুচনা করেছেন। পরে তার বংশধারা এমন এক জিনিস দিয়ে চালু করেছেন যা তুচ্ছ পানির মত তরল। পরে তার নাক, কান ঠিকঠাক করে দিয়েছেন এবং তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন। তোমাদেরকে তিনি কান, চোখ ও দিল দিয়েছেন। তোমরা কমই শোকরিয়া আদায় করে থাকা। (৭-৯ আয়াত)

রূহ আভিধানিক অর্থে আত্মা, সত্তা, শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কুরআনের ভাষায় রূহ-আত্মা, পবিত্র আত্মা, আল্লাহর হুকুম, অহী, শক্তি ও জিবরাইল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রুহুল আমিন ও রুহুল কুদ্দুস জিবরাইল (আ.) এর নাম। রূহ বলতে সেই জীবনী শক্তিকে বুঝায় যার মধ্যে চিন্তা, চেতনা, বিবেক-বুদ্ধি, ফয়সালা ও ইচ্ছা প্রয়োগের শক্তি নিহিত থাকে।

এই মর্যাদাবান ও গুণ সম্পন্ন রূহ এই জন্য দেয়া হয়েছে যে, মানুষেরা যেন বিবেক খাটিয়ে দুনিয়ায় চলাফেরা করে। বিবেকহীন জন্তু জানোয়ারের মত যেন না চলে। চোখ দেয়া হয়েছে যেন অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখে, অন্ধের মত না চলে। কান দেয়া হয়েছে চেতনার জ্ঞান দিয়ে শোনার জন্য, বধির হয়ে থাকার জন্য নয়। দিল দেয়া হয়েছে প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য, চিন্তা ও কর্মের দ্বারা নির্ভূল পথে চলার জন্য।

হালাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

يَسْئَلُوْنَكَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ، قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ، وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ، فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، وَاتَّقُوا اللهَ، اِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ-

লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে? বলে দাও সমস্ত পাক পবিত্র জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। আর যে সমস্ত শিকারী প্রাণীকে শিকারের জন্য তোমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছ। তারা তোমাদের জন্য যে শিকারী ধরে রেখেছে তাও তোমরা খেতে পার। তবে তার উপর আল্লাহ্র নাম নিতে হবে। আল্লাহর আইন ভাঙ্গার ব্যাপারে সাবধান। অবশ্য আল্লাহর হিসাব নিতে বেশী দেরী হয়না। (সুরা মায়েদা-৪)

আজ তোমাদের জন্য সমস্ত পাক পবিত্র জিনিস হালাল করে দেয়া হয়েছে। আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। আরো হালাল করা হলো মোমেন মুসলমান সতী মেয়ে ও আহলে কিতাবদের সৎসতী মেয়েদের। তবে শর্ত হলো মহরানা দিয়ে বিয়ে করে তাদের রক্ষক হবে। শুধু যৌন লালসা পুরণ বা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করতে পারবে না। যে ঈমানের নীতি (এই নীতি) অমান্য করবে তার জীবনের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং আখেরাতে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (মায়েদা-৫)

এই আয়াত নাজিলের বেশ কয়েকটি কারণ পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রসিদ্ধ কারণ হলো ইবনে আবু হাতেম (র.) বলেন তাঈ বংশের দু'জন ব্যক্তি আদী ইবনে হাতেম ও যায়েদ ইবনে মাহালহাল (রা.) রাসুল (সা.) এর নিকট জিজ্ঞেস করেন, মৃত্যু জন্তু তো হারাম করা হয়েছে এখন হালাল কোন কোন জিনিস? তখন এই আয়াত নাজিল হয়। (ইবনে কাসির)

তারা আরো জিজ্ঞেস করেন ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.) আমরা এমন এলাকায় থাকি যেখানে মেহমান আপ্যায়নের জন্য কুকুর ও শিকারী পাখি দিয়ে পশু শিকার করে মেহমানদারী করা হয়। অনেক সময় তারা জীবিত প্রাণী ধরে আনে আবার অনেক সময় তা মৃত পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেছেন মৃত প্রাণী হারাম। তাহলে প্রাণীগুলোর হুকুম কি? তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

মূল বিষয় হলো প্রশ্নকারীরা জানতে চায় যে কোন কোন জিনিস আমাদের জন্য হালাল আর কোন জিনিস হারাম তা সুস্পষ্ট ভাবে বলে দিক। কারণ পূর্বে মানুষের মাঝে ধর্মীয় ধারনা এই ছিল যে সব কিছুই হারাম শুধু যা হালাল বলে দেয়া হয়েছে তাছাড়া। তাই তারা হালাল জিনিসের একটা তালিকা চাচ্ছিল আর বাকীগুলোকে তারা হারাম মনে করবে। এখানে আল্লাহ পাক তাদের এ ধারণা দুর করে দিয়ে ঘোষনা করলেন যে, পাক পবিত্র সব জিনিষই তোমাদের জন্য হালাল। শুধু আমি যা হারাম করলাম তাছাড়া। এতে হালালের পরিধিটা অনেক বেড়ে গেল। হারামের পরিধি সংকোচিত হয়ে এলো।

শিকারী প্রাণীর শিকার হালাল বলে যে কথা বলা হয়েছে তাহলো কুকুর, বাজপাখী, চিতাবাঘ ও যে সব পশু-পাখি দ্বারা মানুষ শিকারের কাজ করে থাকে তা সবই এর মধ্যে গণ্য। শিক্ষা দেয়া প্রাণীর গুণ হলো তারা যা শিকার করে তা না খেয়ে মালিকের জন্য ধরে নিয়ে আসে। এ কারণে তাদের শিকার হালাল আর হিংস্র প্রাণী শিকার ধরে মারে বা খেয়ে ফেলে বলে সেটা খাওয়া হারাম।

শিকারী জন্তু শিকার ধরার জন্য পাঠানোর সময় ৪টি শর্ত পাওয়া গেলে তা খাওয়া হালাল।

১. কুকুর বা বাজ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।
২. নিজে শিকারীকে শিকার ধরার জন্য পাঠাতে হবে।
৩. শিকারী নিজে শিকার খাবেনা মালিকের জন্য নিয়ে আসবে।
৪. শিকারীকে পাঠানোর সময় আল্লাহর নামে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলে পাঠাতে হবে।

এ শর্তগুলো পাওয়া গেলে শিকার যদি মরাও হয় তাহলেও খাওয়া হালাল হবে। আর যদি জীবিত থাকে তাহলে যবেহ করা ছাড়া হালাল হবে না।

ইহুদী ও নাসারা বা খৃষ্টানদের সাথে খেতে অথবা আমাদের সাথে তাদের খেতে কোন প্রকার বাধা নিষেধ বা ঘৃণার কারণ নেই। আমরা তাদের সাথে এবং তারা আমাদের সাথে খেতে পারে। তবে এ বিষয়ে একটি সাধারণ নিয়ম বলে দেয়া হয়েছে যে, পাক পবিত্র জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। আহলে কিতাবগণ যদি এ নিয়মের তোয়াক্কা না করে হারাম জিনিস এর সাথে মিশাল করে অথবা আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য নামে জবেহ করে তাহলে তা খাওয়া হালাল হবে না।

এ আয়াতে ইহুদী খৃষ্টান মেয়েদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সেই সাথে একথাও বলা হয়েছে যে তাদের মধ্যে যারা পবিত্র নারী তারা। আর যারা

পরপুরুষের সাথে মেলামেশা করে তাদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়নি। আয়াতে একথাও বলা হয়েছে যে ইহুদী খৃষ্টানদের মেয়ের পাল্লায় পরে তাদের খাতিরে যেন ঈমান নষ্ট করে ফেলা না হয়।

খরচ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ، قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتمٰى

وَ الْمَسكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ، وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللهَ بِه عَلِيْمٌ

লোকেরা জিজ্ঞেস করে আমরা কি খরচ করব? বলে দাও তোমরা যে মালই খরচ কর নিজের বাবা-মার জন্য, আত্মীয় স্বজনের জন্য, ইয়াতিম ও মিসকীনদের জন্য এবং মুসাফিরের জন্য করবে। আর তোমরা যে ভাল কাজই করনা কেন আল্লাহ তা জানেন। (বাকারা-২১৫)

এ আয়াতের শানে নুজুলে বলা হয়েছে আমর ইবনে নূহ (রা.) রাসুল (সা.) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাদের সম্পদ হতে কি খরচ করবো এবং কোথায় খরচ করবো? এ প্রশ্নের মধ্যে দুটো অংশ লক্ষ করা যায় একটি কি খরচ করবো, দ্বিতীয়টি কাদের জন্য খরচ করবো। এ প্রশ্নের জবাবে উপরের আয়াত নাজিল হয়। আয়াতে কি পরিমান খরচ করবো এ বিষয়ে গুরুত্ব না দিয়ে কাদের জন্য খরচ করতে হবে এ বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন ও মুসাফিরের জন্য খরচ করবে। আর যে কোন ভাল কাজে খরচ কর না কেন আল্লাহ তা জানেন এবং এর বদলা অবশ্যই দিবেন।

ঠিক এভাবেই আরেকটি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এ সুরার ২১৯নং আয়াতের মধ্যে। সেখানে সাহাবীরা রাসুল (সা.) কে বলেন, আমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হয়েছে। আমরা কি পরিমান ব্যয় করবো তা ভালভাবে জানতে চাই? তখন আল্লাহ ২১৯নং আয়াতে বলে দিলেন তোমাদের প্রয়োজন পুরুন করে যা অতিরিক্ত তা সবটুকুই ব্যয় কর। (এ বিষয়ে আরো জানতে পারবেন ২১৯নং আয়াতের ব্যাখ্যায়)

খরচের পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ، قُلِ الْعَفْوَ، كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ–

লোকেরা জিজ্ঞেস করে আমরা আল্লাহর পথে কি পরিমাণ খরচ করবো? বলে দাও তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবটুকু। এভাবেই আল্লাহ তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে হুকুম জানিয়ে দেন। যেন তোমরা দুনিয়া ও আখেরাত দুটোর জন্য চিন্তা ভাবনা করতে পার। (বাকারাহ-২১৯)

ইবনে আবু হাতেম বলেন, মায়াজ ইবনে জাবাল (রা.) ও সালাবা (রা.) রাসুল (সা.) এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.) আমরা আমাদের ধন-সম্পদের দুশ্চিন্তায় পরিবার পরিজন নিয়ে ঘুমোতে পারছিনা। তখন আল্লাহ পাক উপরোক্ত আয়াত নাজিল করেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "আফওয়া" (অতিরিক্ত) শব্দের তাৎপর্য হলো পরিবার স্ত্রী-সন্তানের ভরন পোষনের পর যা বাড়তি থাকে। ইবনে উমর, মুজাহিদ, আতা, হাসান, কাতাদা, কাশেম ইবনে আনাস সহ অনেকেই "আফওয়া" অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ বলেছেন।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল (সা.) কে বললেন, হে আল্লাহ রাসুল, আমার কাছে একটি দীনার আছে। রাসুল (সা.) বললেন, নিজের জন্য খরচ করো। সে বললো আমার কাছে আরও একটি দীনার আছে। রাসুল (সা.) বললেন, তোমার স্ত্রীর জন্য খরচ করো। সে বললো, আমার কাছে আরও একটি দীনার আছে। রাসুল (সা.) বললেন, তোমার ছেলে-মেয়ের জন্য খরচ কর। সে বললো আমার আরও একটি দীনার আছে। রাসুল (সা.) বললেন, এটি তোমার বিবেচনায় খরচ কর। (মুসলিম)

আরেকটি হাদীসে হযরত জাবির (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) এক ব্যক্তিকে বলেন, নিজেকে দিয়ে শুরু কর। তারপর স্ত্রীকে দাও। তারপর যদি থাকে সন্তান সন্ততিকে দাও। তারপর যদি থাকে আত্মীয় স্বজনকে দাও এবং এভাবে সামনে অগ্রসর হও। (মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে আছে হে আদম সন্তান, যদি তুমি তোমার বাড়তি ধন সম্পদ খরচ কর সেটা উত্তম। আর যদি জমা করে রাখ তা ক্ষতিকর। তুমি বেশী বেশী খরচ (দান) করাতে নিন্দিত হবে না। (ইবনে কাসির)

হায়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ، قُلْ هُوَ اَذًى، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ، وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللهُ، اِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

লোকেরা জিজ্ঞেস করে হায়েজ সম্পর্কে? বলে দাও এটা একটা অপবিত্র অবস্থা। এ সময় স্ত্রীদের কাছে থেকে আলাদা থাক। পাক সাফ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাছে যেওনা। যখন তারা পাক পবিত্র হয় তখন আল্লাহ্ যেভাবে হুকুম দিয়েছেন সেভাবে তাদের কাছে যাও। আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করে যারা পাপ থেকে দুরে থাকে ও পবিত্রতার সাথে চলে। (বাকারা-২২২)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইহুদী ও খৃষ্টানেরা হায়েজ হওয়া মেয়েদের সাথে যে আচরন করতো তাহলো ইহুদীরা এ সময় স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা, চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া এমনকি কথাবার্তাও বলতো না। অপরদিকে খৃষ্টানেরা এসময় স্ত্রীদের সাথে সবকিছু করতো এমনকি সহবাস পর্যন্ত। তাদের এই দুই ধরনের আচরনে মুসলমানেরা কি করবে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উপরোক্ত আয়াত নাজিল হয়।

আল্লাহ পাক রাসুল (সা.) কে বলেন, লোকেরা হায়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তাদেরকে বলে দাও হায়েজ অবস্থায় যেন সহবাস না করে। হায়েজ ভাল হলে যে নিয়মে তাদের কাছে যেতে বলা হয়েছে সেভাবে যেন তারা সহবাস করে। (অর্থাৎ সামনের পথে, পিছনের মলদ্বারে নয়)

হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে কতটুকু মেলামেশা করা যাবে এ ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ আছে।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমাদের মধ্যে কারও হায়েজ হলে, রাসুলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিতেন, পড়নের কাপড় ভালভাবে বেঁধে নাও। তারপর তিনি তাদের সাথে (স্ত্রীদের সাথে) মেলামেশা করতেন। (মুসলিম)

এ হাদীস থেকে জানা যায় সহবাস ছাড়া অন্যভাবে মেলামেশা করাতে কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের মতে নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত

বাদ রেখে বাকী অংশের জন্য কোন নিষেধ নেই। ইমাম শাফেয়ী কেবল যৌনাঙ্গ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

হায়েজের মেয়াদ সম্পর্কে হানাফীদের মত সর্বনিম্ন তিনদিন তিনরাত উর্দ্ধে ১০ দিন পর্যন্ত। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহম্মদ বলেন, কমপক্ষে একদিন বেশীর পক্ষে ১৫দিন মেয়াদ। ইমাম মালেকের মতে নির্দিষ্ট কোন মেয়াদ নেই। হায়েজ যখন ভাল হবে তখন তারা পবিত্র বলে গন্য হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ)

মদ জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ، قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا-

লোকেরা জিজ্ঞেস করে মদ ও জুয়ার ব্যাপারে কি হুকুম? বলে দাও এ দু'টো জিনিসের মধ্যে বড় পাপ রয়েছে। যদিও এর মধ্যে মানুষের জন্য কিছুটা লাভও রয়েছে। কিন্তু লাভের চেয়ে গুনাহ (ক্ষতি) অনেক বেশী। (বাকারা-২১৯)

মদের ব্যাপারে কুরআনে তিন পর্যায়ে আয়াত নাজিল হয়। প্রথমে সুরা বাকারার ২১৯নং আয়াত, যা উপরে বর্ণিত হলো। তারপর সুরা নিসার ৪০নং আয়াতে। এখানে বলা হয় হে মুমিনেরা মদ খেয়ে নামাযের নিকটে যেয়ো না। যতক্ষন না তোমরা যা বল তা ভালভাবে বুঝতে পার। তৃতীয় পর্যায়ে সুরা মায়েদার ৯০ ও ৯১ নং আয়াত নাজিল হয়। বলা হয় হে ঈমানদারগন মদ-জুয়া, পুজার বেদি ও ভাগ্য গননার তীর নাপাক ও শয়তানী কাজ। এসব থেকে দুরে থাক। যাতে তোমরা কল্যান পেতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির ও নামাযে বাধা দিতে চায়। তাহলে কি তোমরা এক কাজ থেকে বিরত থাকবে না।

এ আয়াতগুলোর দ্বারা মদ ও জুয়াকে একটি ঘৃণিত জিনিস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসুল (সা.) বলেছেন, মদখোর, মদ পরিবেশক, মদ বেচা, মদ কেনা, মদ যার জন্য কেনা বেচা করা হয়, মদ উৎপাদনকারী, মদের উপকরণ সংগ্রহকারী, মদ পরিবহনকারী, মদ যার জন্য বহন করা হয়, মদ বিক্রির লাভ ভোগকারী, সকলের উপর অভিশাপ বর্ষন করেছেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

মদখোরের শাস্তি হলো, মদপানে কেউ ধরা পড়লে তাকে জুতা মারা, লাথি মারা, ঘুষি মারা, পাকানো কাপড় অথবা খেজুরের ডাল দিয়ে পিটানো। খুব বেশীর পক্ষে ৪০টি বেত মারা। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের মতে ৮০টি

চাবুক মারার কথা বলা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম হাম্বল ৪০টি বেত মারার পক্ষে মত দিয়েছেন।
এ্যালকোহলের মাত্রা কমবেশী করে বিভিন্ন কোম্পানী নানা নামে বাজারে মদ সাপ্লাই করছে। এ্যালকোহল কম থাক আর বেশী থাক সব ধরনের মদই হারাম। বাজারে যে নামে মদ পাওয়া যায় তাহলো- ব্রান্ডি, হুইসকি, রোম, লিকের, পোর্ট, শেরী, ম্যাডেরা, ক্লার্ক, হুক, শ্যাম্পেন, বার্গেন্ডী, বোটার, এষ্টুট, মিডনিথ, এইল, জিন, হল্যান্ড, জেনেভা, বুয়া, কাসাব প্রভৃতি মদ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ভাং, গাঁজা, আফিম, হিরোইন ইত্যাদি নেশাকর ও মাতালকারক দ্রব্যই হারাম।

ইয়াতিমদের সাথে ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَمٰى، قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ-

লোকেরা জিজ্ঞেস করে ইয়াতিমদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে? বল, যে ব্যবহার তাদের জন্য ভাল হয় তাই করা উচিত। তোমরা যদি তাদেরকে নিয়ে একসাথে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা রাখো, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। তারা তোমাদের ভাই। কে ক্ষতিকারী কে হীতাকারী আল্লাহ ভালো করেই জানেন। আল্লাহ চাইলে এ ব্যাপারে তোমাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করতেন। কিন্তু তিনি ক্ষমতা ও পরাক্রমের অধিকারী হবার সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী। (বাকারা-২২০)
উপরের আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে ইয়াতিমদের সম্পর্কে সুরা বনি ইসরাইলের ৩৪নং আয়াতে বলা হয় "ইয়াতিমদের মাল সম্পদের কাছেও যেওনা" এবং সুরা নিসার ১০নং আয়াতে বলা হয় যারা জুলুম নির্যাতন চালিয়ে ইয়াতিমদের মাল সম্পদ খায় তারা শুধু আগুনের দ্বারা নিজেদের পেট ভরায়। এদু'টি আয়াত নাজিল হওয়ার পর ইয়াতিমদের লালন-পালনকারীরা এত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা ইয়াতিমদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা আলাদা করে দিয়েছিল। এ ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করার পরও ইয়াতিমদের মালের কিছু অংশ নিজেদের সাথে মিশে যাবার ভয় করছিল। তাই তারা এ বিষয়ে রাসুল (সা.) কে জিজ্ঞেস করেছিল। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করেন।
এখানে আল্লাহ পাক বলেন, যদি তোমরা তাদেরকে তোমাদের সাথে একত্রে থাকা খাওয়া কর তাতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ তারা তোমাদেরই দ্বীনি ভাই। আর তোমাদের কার অন্তরে গোলমাল করার ইচ্ছা আছে আর কার অন্তরে তাদের কল্যান করার উদ্দেশ্য আছে আল্লাহ পাক ভাল করেই জানেন।

সুদ্দী (রা.) বলেন, ইয়াতিমের অর্থ সম্পদ ভক্ষনকারী কিয়ামতের দিন এমন ভাবে উঠবে যে, তার মুখ চোখ, কান ও নাক দিয়ে আগুনের শিখা বের হতে থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তাদেরকে চিনতে পারবে যে, এ লোকেরা ইয়াতিমের মাল অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করেছে। (ইবনে কাসির)
আবু সাঈদ (রা.) বলেন, আমরা রাসুল (সা.) কে বললাম, মিরাজের রাতে আপনি কি কি দেখেছেন? রাসুল (সা.) বললেন, আমি সেই রাতে আল্লাহর বহু সৃষ্টি ও কীর্ত্তি দেখেছি। তার মধ্যে এমন কিছু লোক দেখেছি যাদের ঠোঁট উটের মত। ফেরেস্তারা তাদেরকে হা করাচ্ছে এবং মুখের ভিতর আগুনের পাথর ঢুকাচ্ছে। আর ঐ লোকেরা ভীষনভাবে চিৎকার করছে। এ দৃশ্য দেখে জিবরাইল (আ.) কে জিজ্ঞেস করলাম এরা কারা? তিনি বললেন, এরা ইয়াতিমদের মাল অন্যায় ভাবে ভক্ষণকারী। তারা নিজেদের পেটে আগুন ঢুকায়েছে, শিঘ্রই তাদেরকে আগুনে ফেলা হবে।
আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমরা অবলা মহিলা এবং ইয়াতিম এই দুই দুর্বলার ধন-সম্পদ থেকে দুরে থাক। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে তাদের সম্পদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য অসিয়ত করতেছি। (ইবনে কাসির)

চাঁদের কমতি বাড়তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ، قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ،

লোকেরা চাঁদের কমতি বাড়তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও এটা মানুষের জন্য সময় ঠিক করা ও হজ্জের মাস আলাদা করার জন্য। (বাকারা-১৮৯)
মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) ও সালাবা আনসারী (রা.) উভয়ে রাসুল (সা.) কে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। কারণ চাঁদের গঠন সূর্য থেকে ভিন্নতর। সেটা এক সময় সরু বাঁকা রেখার মত। আবার ধিরে ধিরে বড় হয়ে গোল থালার মত হয়। তারপর আবার ধীরে ধীরে ক্ষিন হয়ে বিলিন হয়ে যায়। এভাবে চাঁদের ছোট বড় হওয়া মানুষ নিজ চোখে দেখে। আর সূর্যের বিষয়টি সব সমান। ওঠা থেকে ডুবা পর্যন্ত একই আকারের থাকে। তাই আল্লাহ ঘোষনা করলেন দিনক্ষন গননা ও সময় ঠিক করার জন্য আমি চাঁদকে এরূপ করেছি। এটা আকাশের গায়ে লটকিয়ে দেয়া একটি কালেন্ডার। সারা দুনিয়ার মানুষ এ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সময়, তারিখ নির্ধারণ করে নিবে। আশুরা, শবে মেরাজ, শবে কদর, ই'তিকাফ, কুরবানী, হজ্জ ও মাসের গণনাসহ অন্যান্য ইবাদত সমূহ চাঁদের

তারিখ মোতাবেক তারা পালন করবে। এখানে হজ্জের কথা গুরুত্ব দিয়ে এ জন্যই বলা হয়েছে যে, সে সময় সকল ধর্মের মানুষেরা হজ্জ পালন করতো। আর কাবা' ঘর সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। এ ঘরে তাওয়াফ করা থেকে শুরু করে সব রকমের ইবাদতে কোন প্রকার বাধা প্রতিবন্ধকতা ছিলনা। আর চাঁদের তারিখ দেখেই হজ্জ ব্রত পালন করা হয়।

গণীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الاَنْفَالِ، قُلِ الاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ، فَاتَّقُوْا اللهَ وَ اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، وَ اَطِيْعُوْا اللهَ وَ رَسُوْلَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ-

লোকেরা গণীমতের মাল (আনফাল) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তাদেরকে বলে দাও, গণীমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ মাল) আল্লাহ ও তার রাসুলের জন্য। অতএব তোমরা একে অপরের সাথে সম্পর্ক সঠিকভাবে গড়ে তোল। আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য কর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। (আনফাল-১)

● আনফাল শব্দ "নফল" এর বহু বচন। আরবী ভাষায় বাড়তি পাওনাকে নফল বলে। আল্লাহর হক হলো বান্দা তার ফরজ হুকুমগুলো যথাযথভাবে পালন করবে। এর অতিরিক্ত বান্দা যা করবে তা নফল হিসাবে গণ্য হবে। যেমন নফল নামায, নফল রোযা, নফল দান ইত্যাদি। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রাপ্য হক হিসাবে যা পুরস্কার দিবেন তার অতিরিক্ত দেয়াকে আনফাল বলে। এখানে বদরের যুদ্ধে মুসলমানেরা যে মাল লাভ করে ছিল তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অতিরিক্ত দান (আনফাল) বলে ঘোষনা করেছেন। মুসলমানদেরকে একথা বুঝানোর জন্য যে এ সম্পদ আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে বাড়তি দান হিসাবে দেয়া হয়েছে।

● তোমরা একে অপরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোল এ কথা বলার কারণ হলো এই গণীমতের মাল বন্টন সম্পর্কে আল্লাহর হুকুম আসার আগেই মুসলমানেরা নিজ নিজ গোত্রের জন্য অংশের দাবী পেশ করেন। তাদের এই আচরণকে লক্ষ করে আল্লাহ পাক আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দিলেন এটা আল্লাহ ও তার রাসুলের হক। তোমরা নিজেদের মাঝে সম্পর্ক ঠিক রাখ এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য কর যদি নিজেকে মুসলমান হিসাবে দাবী কর।

• মূল কথা হলো বদরের যুদ্ধে যে মুসলমানদের বিজয় হয়েছে এটা তাদের সাহস বা বল ও যোগ্যতার ফল নয় বরং সবকিছুই আল্লাহর রহমত ও সরাসরি সাহায্যের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে একথা বুঝানো। গোটা বিশ্বের বিশাল শক্তিকে তুচ্ছ মনে করে একমাত্র মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে খুশীমনে রাজী হওয়ায় আল্লাহ পাক বিজয় দিলেন। এ যুদ্ধে তারা নিজেদের জনবল, অস্ত্র বলের উপর নয় একমাত্র আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছে। আল্লাহকে সামনে রেখে যুদ্ধ করায় আল্লাহ নিজে কাফেরদের পরাজিত করেছেন। কাফিরেরা যতই শক্তিশালী হোক আল্লাহকে পরাজিত করার শক্তি কারো নেই।

এ যুদ্ধে যে সব মাল সম্পদ মুসলমান সৈন্যদের হাতে এসেছিল, জাহেলী যুগের নিয়ম অনুযায়ী যার হাতে যে মাল ধরা পড়েছে তা সেই পাবে এই মনে করে সবাই নিজ নিজ দখলে রেখে দিল। আল্লাহ জানিয়ে দিলেন এসব মাল সম্পদ সবই আল্লাহ ও রাসুলের মালিকানায় আছে। তাই সব মাল রাসুলের সামনে হাজির করতে হবে। তিনি যাকে যতটুকু অংশ দিবেন তাতেই খুশী থাকতে হবে। আর আল্লাহ নিজের কাজের জন্য ও গরীব মিসকিন বান্দাদের জন্য যে অংশ রাখতে বলবেন তাতেই সবাইকে রাজী খুশী থাকতে হবে।

হারাম মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيْهِ، قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ، وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَاِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ، وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، وَلاَ يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوا، وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ، وَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ، هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ-

লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, হারাম মাসে যুদ্ধ করা কি? বলুন এ মাসে যুদ্ধ করা বড় অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর নিকট তার চেয়ে বড় অন্যায় হলো মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখা, আল্লাহর সাথে কুফরী করা, মসজিদে হারামের পথ আল্লাহ ওয়ালাদের জন্য বন্ধ করে দেয়া এবং হারাম শরীফের বাসিন্দাদের

সেখান থেকে বের করে দেয়া। আর ফিতনা-ফাসাদ হত্যার চাইতে বেশী খারাপ। তারা তো তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেই যাবে। এমনকি যদি তাদের ক্ষমতায় কুলায় তাহলে তোমাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নিবে। (আর তোমরা এ কথা ভালভাবে জেনে রাখো) তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই এই দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের অবস্থায় মারা যাবে দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের আমল নষ্ট হয়ে যাবে। এ ধরনের সব মানুষই দোযখের বাসিন্দা হয়ে সব সময় সেখানেই থাকবে। (বাকারা-২১৭)

অপর দিকে যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের বাড়ীঘর ছেড়েছে এবং জিহাদ করেছে তারা সঙ্গত ভাবেই আল্লাহর রহমতের আশা করে। এবং আল্লাহ তাদের ভুলত্রুটি মাফ করবেন এবং তাদের প্রতি দয়া করবেন। (বাকারা-২১৮)

অর্থাৎ তোমরা যদি হারাম মাসে হত্যাকান্ড করেও থাক, কিন্তু তারাতো তোমাদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিচ্ছে সেই সাথে কুফরীও করছে এবং তোমাদেরকে মসজিদে হারামের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও তাড়িয়ে দেয়া আল্লাহর কাজে একজন কাফিরকে হত্যা করার চেয়ে বেশী মারাত্মক অন্যায়। আর তারা নির্যাতন চালিয়ে মুসলমানদের ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করতো, কুফরীতে ফিরিয়ে আনতো, সেটা হত্যার চেয়ে যঘন্যতম অপরাধ।

কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

يَسْئَلُوكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا-

লোকেরা জিজ্ঞেস করে কিয়ামত সম্পর্কে। বলেদিন এ বিষয়ে আল্লাহ ভাল জানেন। এ ব্যাপারে তুমি কি করে জানবে। সম্ভবত কিয়ামত নিকটে। (সুরা আহযাব-৬৩)

সুরা আ'রাফের ১৮৭ আয়াত-

يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَهَا

লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা কিয়ামতের সেই সময়টা কখন আসবে। বলে দাও এ বিষয়ে জ্ঞান কেবল মাত্র আল্লাহর আছে। যথা সময়ে তা তিনি প্রকাশ করবেন।

কুরআনে কিয়ামতকে বুঝানোর জন্য اَلسَّاعَةُ (আসসাআ'তু) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ সময় বা মুহূর্ত এ শব্দ কুরআনে মোট ৪৭ বার এসেছে। তার মধ্যে ৩৯ বার কিয়ামত অর্থে ৭ বার সময় অর্থে ১বার মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এছাড়া আলাদাভাবে "ইয়াওমুল কিয়ামত" শব্দ ৬৯ বার এসেছে।

কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সুরা জুমারে ৬৮ থেকে ৭০ আয়াতে বলা হয়েছে।

- ঐ দিন (কিয়ামতের দিন) শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে এবং আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব মরে পড়ে থাকবে। শুধু তারা ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ জীবিত রাখতে চাইবেন। এরপর আবার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। তখন হঠাৎ করে (জীবিত হয়ে) সবাই দাড়িয়ে দেখতে থাকবে।
- পৃথিবী তার রবের নুরে চকচক করে উঠবে। আমলনামা এনে রাখা হবে। নবীগণ ও সকল স্বাক্ষীকে হাজির করে দেয়া হবে এবং মানুষের মাঝে সঠিকভাবে ইনসাফের ফয়সালা করে দেয়া হবে। তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না।

প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা আমল করেছে তার পুরোপুরি বদলা দিয়ে দেয়া হবে। মানুষ যা করেছে আল্লাহ তা ভাল করে জানেন।

সুরা নাযিয়াতে বলা হয়েছে-

লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে সেই সময়টি কখন আসবে? (কিয়ামত) (বল) নির্দিষ্ট সময় বলা তো তোমার কাজ নয়। তার (কিয়ামতের) সম্পর্কে জ্ঞান আল্লাহ পর্যন্ত শেষ। তুমি তো শুধু সাবধানকারী তাদের জন্য যারা (ঐ দিনের) ভয় করে। যেদিন এই লোকেরা (কিয়ামত) দেখতে পাবে তখন তারা মনে করবে (এই দুনিয়ায়) শুধু একদিনের বিকেল কিংবা সকাল বেলায় তারা অবস্থান করেছে মাত্র।

এ কিয়ামত সম্পর্কে কুরআনে অসংখ্যবার বর্ণনা দেয়ার পরও মক্কার কাফির মুশরেকেরা রাসুল (সা.) কে বারবার প্রশ্ন করতো যে, কিয়ামত কবে হবে। কারণ তার দিন, তারিখ ও সময় অনির্দিষ্ট থাকায় এ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার দিন, তারিখ, সন ও সময় বলে দিলেও তারা ঈমান আনতো না বরং তাদের ধারনা ছিল কিয়ামত একটি অবাস্তব ও অযৌক্তিক বিষয়। এটাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার লক্ষ্যে বারবার

তাদের এ প্রশ্ন করা। এদেরকে দিন, তারিখ বলে দিলে তখন এরা আবার বলবে ঠিক আছে তোমাদের দেয়া তারিখে কিয়ামত আসুক তখন মেনে নিব। কারণ ঐ তারিখে কিয়ামত হবে কিনা তা কিভাবে বুঝবো।

আসল কথা হলো কিয়ামত হবে একথা বলে দেওয়াই নবীর কাজ। কখন হবে, কিভাবে হবে তা বলে দেয়া নবীর কাজ নয়। এ বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ ভাল জানেন। নবীর কাজ কেবল সতর্ক করে দেয়া।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝা সহজ হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি কবে মারা যাবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা। তবে মারা যাবে এটা নিশ্চিত। এখন বুদ্ধিমান লোকের কাজ হবে মৃত্যুর আগেই তার প্রস্তুতি নেয়া। এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে চলা এবং সর্বদা প্রস্তুত থাকা। এ কাজের জন্য তার মৃত্যু কোন তারিখে কতটার সময় কিভাবে হবে এটা জানা তার জরুরী নয়। তেমনি কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার বিষয়ে দিনক্ষন জানা জরুরী নয়।

আরেকটি বিষয় যেমন দুনিয়ার জীবনে আমরা অনেক বিষয়ই জানতে পারিনা। যেমন বৃষ্টি কোন দিন কোথায় হবে। মায়ের পেটে শুক্র দ্বারা সন্তানের জন্ম নেয়া। আগামীকাল আমার অবস্থা কি হবে। কখন বিপদ মছিবত আসবে, সর্বশেষ জীবন অবসান কবে ঘটবে কিছুই তো আমরা জানিনা। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে। আমাদের জানার যতেষ্ঠ ইচ্ছা থাকলেও এ বিষয়ে মানুষকে সে জ্ঞান দেয়া হয়নি। তাই আল্লাহর ফয়সালাকে চূড়ান্ত মনে করে মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকেনা। তেমনি কিয়ামতের ঘটনাকেও আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। এ বিষয়ে কাউকে কোন ইল্‌ম দেয়া হয়নি এবং দেয়া যেতে পারে না। স্বয়ং মালিক রাব্বুল আলামিনের হাতে এর চাবি কাঠি।

পাহাড়ের পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّ لَا اَمْتًا۔

লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে সেদিন পাহাড়গুলি কোথায় যাবে? বলে দাও, আমার আল্লাহ এগুলিকে ধুলির মত করে উড়িয়ে দিবেন। আর যমীনকে এমন

সমতল ধুসর ময়দানে পরিনত করবেন যে তুমি তাতে কোন উচু নিচু এবং সংকোচন দেখতে পাবে না। (ত্বাহা ১০৫-১০৭)

يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لاَ عِوَجَ لَهٗ، وَ خَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلاَ تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا–

সেদিন সব লোক ঘোষনাকারীর ডাকে সোজা চলে আসবে। কেউ কোন প্রকার দম্ভ দেখাতে পারবেনা। আর সমস্ত আওয়াজ দয়াময়ের সামনে ক্ষীন হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ছাড়া কিছুই শুনতে পাবেনা। (ত্বাহা-১০৮)

يَوْمَئِذٍ لاَّتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهٗ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا–

সেদিন দয়াময় রহমান যাকে অনুমতি দিবেন ও যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া আর কারোর সুপারিশ কাজে আসবেনা। (ত্বাহা-১০৯)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لاَ يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا–

তাদের সামনের ও পিছনের সব অবস্থা তিনি জানেন। যা অন্যদের জানা নেই। (ত্বাহা-১১০)

সূরা কাহাফে বলা হয়েছে, (আসলে ঐ দিনের চিন্তা করা উচিত) যেদিন আমি পাহাড়কে চলমান করে দেবো এবং তোমরা জমিনকে উন্মুক্ত দেখতে পাবে। (কাহাফ-৪৭)

এ প্রশ্ন তখনই উত্থাপিত হয়েছে যখন কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। তাদের ধারনা কিয়ামতে যখন সব কিছু সমান করা হবে তখন পাহাড়গুলো কি করবে? এ কথা ভালভাবে বুঝতে হলে আরবের মক্কার অবস্থান বুঝতে হবে। মক্কার চারিধারে উচু পাহাড় আর পাহাড়। সেদিকে ইঙ্গিত করে এই প্রশ্ন করা হয়েছে। আর ওহির মাধ্যমে এ কথার জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে যে পাহাড়গুলিকে ধূলার মত গুড়া করে তুলার মত উড়ে দেয়া হবে। সমস্ত পৃথিবীকে সমান ভূমি বানিয়ে দেয়া হবে। কোথাও কোন উঁচু নিচু থাকবে না; একটি বিশাল ফরাশের মত- যাতে কোন ভাঁজ বা উঁচুনিচু থাকবে না। কিয়ামতের দিনে পৃথিবীর রূপ যে পরিবর্তন হবে এ বিষয়ে সূরা ইনশিকাকে বলা হয়েছে। যমিনকে প্রশস্ত করে দেয়া হবে। ইমফিতারে বলা হয়েছে, নদী সমুদ্রকে ফাটিয়ে ফেলা হবে। অর্থ্যাৎ তার পানি জমিনে উঠে আসবে। সুরা তাকভীরে বলা হয়েছে সমুদ্র ভরাট করে দেয়া হবে। আর এ সুরাতে (ত্বাহা) বলা হল পাহাড় পর্বত চূর্ণ

বিচূর্ণ করে সমতল করা হবে। এতে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে যে ধারণা বেরিয়ে এলো তাতে নদী-সমুদ্র ভরাট করে, পাহাড় পর্বত গুড়ো করে, উচু-নিচু সমান করে, বন জঙ্গল সাফ করে এক বিশাল সমতল মাঠ তৈরী করা হবে। সুরা ইবরাহীমে বলা হয়েছে, এভাবে পৃথিবীর রূপ বদলিয়ে দিয়ে এখানে হাশরের ময়দান কায়েম করা হবে।

জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

সূরা কাহাফের ৮৩-৯৫ আয়াত এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে তা বর্ণিত হল-

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا-

৮৩. লোকেরা তোমাকে জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তাদেরকে বল, আমি তার কিছু অবস্থা তোমাদেরকে শুনাচ্ছি।

اِنَّا مَكَّنَّا لَه فِيْ الْاَرْضِ وَ اٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا-

৮৪. আমি তাকে পৃথিবীতে আধিপত্য (কর্তৃত্ব) দান করেছিলাম, তাকে সব রকম উপায় উপাদান ও দান করে ছিলাম।

فَاَتْبَعَ سَبَبًا-

৮৫. সে (প্রথমে পশ্চিম দিকে এক অভিযান চালানোর) ব্যবস্থা করে।

৮৬. চলতে চলতে সে যখন (পশ্চিমে) সূর্য ডুবে যাওয়ার স্থানে পৌছল তখন সে সূর্যকে এক কালো পানিতে ডুবে যেতে দেখতে পেল। অর্থাৎ এরূপ মনে করা হতো যেন সূর্য সমুদ্রের কালো পানিতে ডুবে যাচ্ছে। যেখানে গিয়ে সে এক জাতির সাক্ষাত পেল। আমি বললাম হে জুলকার নাইন, তোমার শক্তি আছে। তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার আবার তাদের সাথে ভাল ব্যবহারও করতে পারো।

৮৭. সে বললো, তাদের মধ্যে যে জুলুম করবে তাকে শাস্তি দিব। তারপর যখন সে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে তখন তিনিও কঠিন শাস্তি দিবেন।

৮৮. আর তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে। আর আমরা তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবো।

৮৯. পরে সে আরেকটি অভিযানে বের হয়।

৯০. এমনকি সে সূর্য উদয়ের স্থানে গিয়ে পৌছে (অর্থাৎ পূর্ব দিকের শেষ সীমা পর্যন্ত) সেখানে সে দেখলো সূর্য এমন এক জাতির লোকের উপর উদয় হচ্ছে যাদের সূর্যের তাপ থেকে বাচার কোন উপায় নেই।

৯১. এই ছিল তাদের অবস্থা। আর জুলকার নাইনের নিকট যা ছিল তা আমরা জানতাম।
৯২. তারপর সে আরেকটি অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করলো।
৯৩. সে যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গায় পৌছলো তখন সে এক জাতিকে পেল যারা একেবারে বুঝতে পারছিল না।
৯৪. তারা বললো, হে যুলকার নাইন ইয়াজুল মাজুজ এই এলাকায় চরম অশান্ত সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে আমরা কিছু করা ধার্য করে আপনাকে দেই, আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর তৈরী করে দেন।
৯৫. তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তাই যথেষ্ঠ। তোমরা শুধু শ্রম দিয়ে আমাকে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মান করে দিচ্ছি।

কালালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

يَسْتَفْتُوْنَكَ، قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِى الكَلَلَةِ، اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيسَ لَه وَلَدٌ وَ لَه اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، وَ هُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ، فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ، وَ اِنْ كَانُوْا اِخْوَةً رِّجَالاً وَّ نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ، يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوا، وَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْم-

লোকেরা তোমাকে "কালালা" সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে? বলে দাও; আল্লাহ তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন। যদি কেউ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার যদি একজন বোন থাকে, তাহলে সে তার রেখে যাওয়া সম্পদের অর্ধেক পাবে। আর যদি বোন সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায় তাহলে ভাই তার সম্পদের ওয়ারিশ হবে।
আর যদি মৃতের ওয়ারিশ দুই বোন হয় তাহলে তারা সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। আর যদি কয়েক ভাই বোন ওয়ারিশ হয় তাহলে মেয়েদের অংশে এক ভাগ আর পুরুষের অংশে দুই ভাগ পাবে। আল্লাহ তার আইন কানুন স্পষ্ট করে বলে দেন যাতে তোমরা ভুল পথে না যাও। আল্লাহ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। (নিসা-১৭৬)

"কালালা" শব্দের অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে। তবে প্রশিদ্ধ মত হলো যার সন্তান নেই এবং বাপ দাদাও নেই।

মেয়েদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِيْ النَّاسَاءِ، قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ، وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِيْ الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِيْ لاَ تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ، وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ، وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا-

লোকেরা তোমার কাছে মহিলাদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বলে দাও আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন। সেই সাথে এ কথাও মনে করে দিচ্ছেন যা আগে এই কিতাবে শুনানো হয়েছে। অর্থাৎ ঐ ইয়াতিম মেয়েদের সম্পর্কে হুকুম শুনানো হচ্ছে। যাদের হক তোমরা আদায় করছ না এবং যাদেরকে বিয়ে দিচ্ছ না। (অথবা লোভের কারণে নিজেরা বিয়ে করতে চাও) আর যে শিশুরা কোন ক্ষমতা রাখেনা তাদের সম্পর্কে বিধান সমূহ- আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ইয়াতিমদের সাথে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করবে। আর তোমরা যে ভাল কাজই করবে অবশ্যই আল্লাহর নিকট তা জানা। (সুরা নিসা-১২৭)

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, উম্মে কোহাত এর মেয়েদের ব্যাপারে এই আয়াত নাজিল হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, যে সব ইয়াতিম মেয়েদের বাবার সম্পদ ছিল তাদের অভিভাবকেরা তাদের উপর জুলুম করতো। সম্পদশালী হওয়ার সাথে সাথে যদি সুন্দরী হত তাহলে নিজেরা বিয়ে করতে চাইত। মহরানা ও জীবন যাত্রার খরচাদী না দিয়ে বরং তাদের সম্পদ এক তরফাভাবে ভোগ করতো। আর যদি কুৎসিত হত তাহলে নিজেরা বিয়ে করতো না অন্যের সাথেও বিয়ে দিতে চাইত না এই ভয়ে যে, সম্পদ হাত ছাড়া হবে। তাদের ব্যাপারে এই আয়াত নাজিল হয়। (রুহুল মায়ানী)

কালালা ও মেয়েদের সম্পর্কে ফতোয়া এদুটি বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য লেখকের "কুরআনের ভাষায় আল্লাহর দেয়া দু'টি ফতোয়া" বইখানা পড়ুন।